মুসলমানি অনুষ্ঠানে সঙ খেলা

শহরের মুসলমানি অনুষ্ঠানের চিত্র গ্রামের মতোই
ছবি : বাহারুল করিম সোহাগ

গ্রামের বাড়ির উঠানে সঙের নারীদের নৃত্যগীত

সাইমন জাকারিয়া

বাংলাদেশের গ্রাম পর্যায়ের শরিয়তপন্থি মুসলমান নারী-পুরুষও যে তাদের কৃত্যমূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বা জন্মকৃত্যে, মুসলমানিতে, বিবাহে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নাচ-গান করে থাকে তা আমাদের সাহিত্যের কোথাও আছে কি? একবার ভেড়ামারার পরানখালী গ্রামের এক হাজাম গায়েন হায়দার আলীর দলের 'পদ্মার নাচনে'র আসরে হাজির হয়েছিলাম। আসর শেষে তাকে প্রশ্ন করেছিলাম– 'আচ্ছা, আপনি তো হাজাম, আপনি কোথাও মুসলমানি দিতে গেলে নাচ-গান করেন কি?' উত্তরে তিনি জানিয়েছিলেন– কারো বাড়ি মুসলমানি দিতে গেলে তিনি প্রথমেই মুসলমানির ছেলেকে ঘিরে গান-বাজনা করে নেন। এতে ছেলেটার মুসলমানিভীতি কমে। আর মুসলমানি অনুষ্ঠানে তিনি যে গান গেয়ে থাকেন, তা হচ্ছে–'কি দিবি বল সনেকা, বল-না ছেলের নুনু কাটি...ইত্যাদি।' এ রকম মুসলমানি দেবার প্রচলন ফরিদপুর অঞ্চলেও আছে। ধারণা করতে পারি, এ ধরনের প্রচলন নতুনকালের নয়, বাংলাদেশে এই ধারা হয়তো বেশ আগে থেকেই। কিন্তু কোনো এক অজ্ঞাত কারণে তার কোনো তথ্যসূত্র আমাদের সাহিত্যে ধারণ করতে পারেনি। হাজামদের মুসলমানি দেবার এই রীতির সঙ্গে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির অনেক কিছুই এখনো এভাবে সাহিত্য প্রাণের বাইরে রয়ে গেছে এবং যাচ্ছে। সে রকম একটি পর্ব হচ্ছে 'মুসলমানি অনুষ্ঠানে সঙ খেলা'।

কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ অঞ্চলে মুসলমানি অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রধান পর্ব হচ্ছে– হাজাম ছেলের মুসলমানি দিয়ে যাবার ছয় দিন পর সাত দিনের মাথায় ছেলেকে গোসল দেওয়া হয়। এই গোসলের আগের রাতে ওই বাড়িতে প্রতিবেশী নারীরা বিভিন্ন ধরনের সঙ সেজে এসে খণ্ড অভিনয়ের সঙ্গে নাচ-গান করে থাকে। এ অনুষ্ঠানে সঙ সাজার আসল উদ্দেশ্য আনন্দ করা এবং আনন্দ দেয়া। এই উভয়ধর্মী আনন্দের মধ্যে সঙের নারীরা ছেলের নিকটজনদের কাছ থেকে কিছু কিছু টাকা আদায় করে থাকে। টাকা আদায়ের পর্বটিও বাড়ির সবার মাঝে আরেক আনন্দ রচনা করে। শেষের এই আনন্দটা ওই বাড়িতে আগতদের মাঝে সঙ সেজে আনন্দদানের পারিশ্রমিক তুলে নেবার মতো কোনো কৌশলী প্রক্রিয়া নয়তো?

একদিন রাতে ছোট ভাই মিঠুর মোবাইলে আমাদের গ্রাম বসন্তপুর থেকে একটি মিসকল এলো। গ্রামে এখনো আমাদের মা থাকেন, মা কখনো মিসকল করেন না, 'আজ হঠাৎ মিসকল!' এমনই বিস্ময় প্রকাশ করে মিঠু কলব্যাক করল। না, মিসকলটা মায়ের নয়। আমাদের চাচাতো ভাই কুরবানের। তার ছেলে রতনের মুসলমানি হয়েছে। তাই চাচাতো ভাই গ্রামে ছড়িয়ে পড়া মোবাইল ফোনের সুবাদে পাশের বাড়ির মোবাইল থেকে একটা মিসকল মেরে আমাদের দুই ভাইকে দাওয়াত দিয়ে বসল। এ হচ্ছে হাল আমলের দাওয়াত প্রক্রিয়া। মিঠু ফোন রেখে বলল, 'যাবি নাকি? কুরবান ভাইয়ের ছেলে

রতনের মুসলমানি। বেচারার একটাই ছেলে। অবশ্য মেয়েও আছে একটা, তার বিয়ের অনুষ্ঠান এখনো মেলা দূর। তাই ছেলের মুসলমানিতে আমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে একজনের অন্তত যাওয়া উচিত।'

উচিত-অনুচিত বিবেচনা করে নয়, আমার আগ্রহ অন্যত্র, সেটা আমাদের গ্রামের মুসলমানিতে প্রচলিত সঙ সাজবার ও গীত গাইবার অনুষ্ঠানটির প্রতি। এক সময় আমি নিজেই মুসলমানির অনুষ্ঠানে মায়ের সঙ্গে সঙ সেজে বিচিত্র ধরনের অভিনয় করতাম, টাকা তুলতাম। পাড়ার নারীরা তাতে খুব মজা পেত। অবশ্য সঙ সাজার আয়োজনের পাশে গ্রামের নারীদের টানা সুর করা গীতের প্রসার ছিল প্রার্থনার মতো। আমার আগ্রহ বা সংশয় হচ্ছে– 'আমাদের গ্রামে এখনো কি মুসলমানির অনুষ্ঠানে এসব হয়?' উত্তরটা নিজে গিয়েই দেখতে চাই। দু-তিন দিনের মাথায় ঢাকা থেকে ২৭৭ কিলোমিটার দূরে আমাদের গ্রামের উদ্দেশে রওনা দিলাম।

সঙের নারীরা বারান্দায় বসা অতিথি ছেলের ফুপার কাছে নেচে গেয়ে টাকা চাইছে

চাচাতো ভাইয়ের ছেলে রতনের মুসলমানি-কৃত্যের গোসলের ঠিক আগের সন্ধ্যায় গ্রামে পৌঁছলাম। একটু ফ্রেশ হয়ে নিয়ে মায়ের হাতে খাবার খেয়ে হঠাৎ ডাক শুনি, রতনদের উঠানে সঙ সেজে প্রতিবেশী নারীরা আসতে শুরু করেছে। আমি এবং মা টেপরেকর্ডার-ক্যামেরা নিয়ে রতনদের উঠানে গিয়ে দাঁড়ালাম।

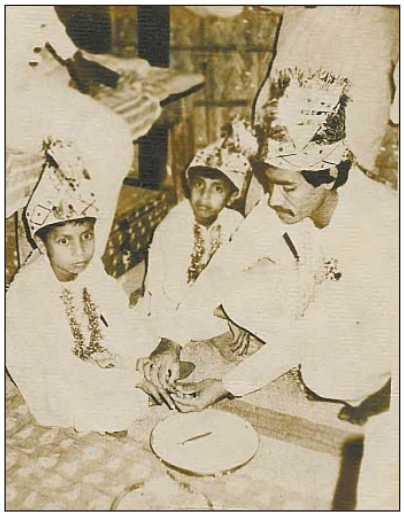

বিশ বছর আগে লেখকের মুসলমানি অনুষ্ঠানে লেখককে আঙটি পরিয়ে দিয়েছিলেন তার দুলাভাই

ছবি : দীপ্তি

উঠানে তখন হাজির হয়েছে একজন মাত্র সঙের নারী, হাতে তার একটি সবুজ রঙের পেঁপের পাতা, কাঁধে একই সঙ্গে ঝোলানো এটি কাপড়ের ঝোলা ও একটি সিমেন্টের বস্তার তৈরি বাজারের থলে। পরনে তার নিত্যদিনের পুরনো শাড়ি। গ্রামের সবাই তাকে 'ছানার মা' বলেই চেনে, তবে তার একটি নামও আছে– ডালিম। বয়স সত্তরের কাছাকাছি। সঙ সেজে সে প্রথম পর্যায়ে যে অভিনয় করে, তা একজন ভাঙুড়ের। ভেঙে ভেঙে ভাঙ খাওয়া ব্যক্তির মতো সে যখন অসংলগ্ন কথা বলে, তখন দর্শকদের কেউ কেউ তাকে শুধরে দিতে চায়। কিন্তু ভাঙুড়ে কি তার অসংলগ্ন কথা ছাড়ে...। ভাঙুড়ে ছানার মা বলে–'ভাতে ভাত ছুয়ানী হোবি না?' উত্তরে বাড়ির অতিথিদের মধ্য থেকে ছেলের ফুপু সাকেরা বলে–'মোছলমানি, মোছলমানি হয়চে।' ভাঙুড়ে ছানার মা তার কথায় বেশ বিরক্ত প্রকাশ করে বলে–"আবার ব'লে! ওই যে থোনেন, ছেলের ছোতো-দাদী, তারউ আবার ভাত ছুয়ানী, তার ভাতছুয়ানী, একুন সেই ভাত ছুয়ানীর জোন্যি, একুন আমি বহুদূরতে আসতিচি, তে শুনলাম কি, নাতির হচ্ছে ভাত ছুয়ানী, তাই আবার খুতি নিয়াসলাম, দ্যাও, দোড়োতি দোড়োতি আসলাম, আমার এক বুড়ো আচে, সে আবার নুটি-নুজগার করতি বলে, সে আবার নয়াডা ছাড়ে থাকতি পারে না, তাই দ্যাও গো...।"

এর পর ছানার মা তার হাতে ধরা সবুজ রঙের পেঁপে পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে পান খায় এবং পান খেতে খেতে রান্নাঘরের বারান্দায় বসে থাকা রতনের দাদীর সামনে গিয়ে নেচে নেচে গাইতে থাকে–

'শুনি বোলে ছেলের দাদীর দাঁত থুলা থুলা
দাঁতের উপর থুয়ে ভাঙ বেচপো তুলা তুলা
ও ভাঙ বেচপো নারে নবা বেটিরে
ও ভাঙ বেচপো নারে তোরে বেটিরে
আগে যদি জানতাম ভাঙে এমন কড়ি
ডোল-ডালি করে ভাঙ থুতাম সারি সারি।'

রতনের দাদীর দাঁতগুলো পান খেতে খেতে কালো আর লালচে হয়ে গেছে, তার ওপর আবার অধিকাংশ দাঁতই এর মাঝে ঝরে গেছে, তাই ভাঙুড়ে সঙ ছানার মা'র এই গান রতনের দাদীর দাঁতকে নিয়ে।

রতনের দাদীর পাশেই রান্নাঘরের বারান্দায় বসেছিল রতনের দাদা। ছানার মা এবারে ছেলের দাদার কাছে এল ঘটনা প্রকাশ করে। কেননা, সে সঙ সেজে এসেছে ছেলের আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে অর্থ খসানোর আনন্দ নিতে। সঙ করে আনন্দ দিয়ে এবারে সে টাকা চায়–'ছেলের দাদা ভালো নোক, ছেলের দাদা বোঝচে সব... সে আমারে কিচু দেবে...।'

তার টাকা চাওয়ার এই কৌশলের মধ্যে আরো দুইজন নারী সঙ আলতাফের মা ও ছেলের মামী হাসিয়া বেগম উঠানে আসে। তারা দুইজন ছেলের দাদার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় এবং ছেলের দাদাকে দেখিয়ে প্রশ্ন করে– 'এই লোকটার কী হয়চে?' এই প্রশ্নের উত্তর করে তার সহযোগী সঙের নারী হাসিয়া বেগম–'এই লোকের বিদনা হয়চে।' সাথে সাথে আলতাফের মা নেচে নেচে গাইতে শুরু করে–

'ওকি সুন্দর, বুড়োরে তুমি
তারও কান্দনে মইলাম রে।
কান্দে কান্দে বুড়ো বয়াসের লাগি।
সাবান-গামছা কিনে রে বুড়ো
গোছল ভালো করে রে।
কান্দে কান্দে বুড়ো বয়াসের লাগি॥'

আলতাফের মায়ের এই গানের সঙ্গে সহযোগী সঙ হাসিয়া বেগম তার পায়ে বাঁধা ঘুঙুরে তাল ঠুকে দোহারকি গাইতে থাকে নেচে নেচে।

ছেলের দাদাকে ঘিরে আগত সঙদের

গানের পর্ব খুব সহজে শেষ হবার নয়। ছেলের দাদার বয়স, চেহারা, পোশাক, দাড়ি, চলন-বলন কোনো কিছুই সঙদের গান থেকে বাদ যায় না। এক সময় ভাঙুড়ে সঙ ছানার মা বারান্দায় সাদা দাড়ি মুখে বসে থাকা ছেলের দাদার দাড়িতে হাত বুলিয়ে দেয় এবং হঠাৎ করেই গাইতে থাকে–

'ছেলের দাদার দাড়ি রে। বুচি বুচি তাড়িরে।
ওই না দাড়ি দেকে রে। বেজি বাসা করে রে।
বেজি তুমি ন'ড়ো না। দাড়ি নষ্ট করো না।
আয়না ধরে দেখো না। দাড়ির সুরোত কি নারে॥'

ছেলের দাদাকে ঘিরে নাচ-গানের এই আয়োজনের মধ্যে ছানার মা হঠাৎ আমাকে দেখে ফেলে এবং আমার দিকে এগিয়ে এসে চিৎকার করে ঘোষণা করতে থাকে–'শোনেন আপনেরা...।'

উঠানের দর্শক অতিথিদের মধ্যে ছেলের আরেক ফুপু রোকেয়া বলে– 'হ কও।' ছানার মা চিৎকার করে বলতে থাকে– 'আপনাদের এলাউন্স করে দিচ্ছি, ছেলের কবি চাচা আসেচে, উনার কাচতে বড় দান নিতি হোবি।' তার কথায় সায় দেয় সহযোগী সঙ হাসিয়া বেগম–'বড় একখোগ লোট।' মুহূর্তের মধ্যে আমাকে ঘিরে সঙের নাচ-গান শুরু হয়ে গেল–

'কুতা থিকে আসলেরে দুলুত্তার
দেও টাকা। দেও টাকা কি না রে।
ছেলের কাকা পায়েরে দুলুত্তার
ওই ওরে রয় ভালো। ও কি না রে॥'

আমি জানি না, দুলুত্তার শব্দটির অর্থ কী? আসরের মধ্যে তাদের জিজ্ঞেসও করা হয়নি। আমি তাদের সঙের আসর শেষ হলে অর্থ (টাকা) দেবো বলে কড়াল (প্রতিজ্ঞা) করলাম। আমার প্রতিজ্ঞায় তারা এবার নতুনভাবে নেচে উঠল।

এর মধ্যে আরেক সঙ নুলো সেজে রতনদের উঠানে এলো। ছানার মা তখন ভোল পাল্টে নুলো সঙের জন্য ভিক্ষা চাইতে শুরু করে–'এই বাবা সগোল, এই মেয়ে মানুষটা নুলো, সিভিল সারজোন ডাক্তার কাছে নিতি হবি, বাবা সগোল আপনার কাছে কিছু পয়সা-কড়ি চাই...।'

নুলো ভিখারির সঙ সেজে এসেছে আমাদের আরেক প্রতিবেশী রেহেনার মা, নাম রাবেয়া খাতুন। তার নুলো ভঙ্গির হাঁটাচলার অভিনয়ে বাড়ির সবাই যখন হাসছে, তখন রতনের মামী হাসিয়া অকারণে তার পায়ের ঘুঙুর বাজায়। বিশেষভাবে তার দিকে লক্ষ্য করে দেখা যায়– তার হাতে জরির রাখিবন্ধন আর গলায় জরির মালা ঝুলছে। তাকে উসকে দিতে রতনের রোকেয়া ফুপু বলে উঠল–'ও ঘুঘরিআলা নাচো।' হাসিয়া বেগম এবার যেন প্রাণ ফিরে পেল, সে সঙ্গে সঙ্গে ঘুঙুর বাজিয়ে নাচতে-গাইতে থাকল–

শহরের মুসলমানি অনুষ্ঠানে বয়স্কদের বাহারি পান খাবার উৎসব
ছবি : বাহারুল করিম সোহাগ

মুসলমানিতে ছেলের দাদাকে কেন্দ্র করে সঙের নারীদের হাস্যরস

'ছোটখাটো বাদেনী তুমি লাম্বা মাতার কেশও রে
বাঁশি বাজাইয়া রে থুলো না থুলো না কন্যা ঘরে
করল আমার বাউলা ঝুলা রে।
বাঁশি বাজাইয়া রে।
খাইও না খাইও না তুমি আমার কলসের পানিরে...॥'

হাসিয়া বেগমের সঙ্গে বৃত্তাকারে সমবেতভাবে নাচে অংশ নিল উঠানে আগত সঙের নারীদের সবাই। সবার সমবেত প্রাণবন্ত নাচের আনন্দে হাসিয়া বেগম মুহূর্তের মধ্যে গান পরিবর্তন করে নিয়ে নতুন সুরের গান ধরল–

'একটা পয়সা কি দেবেন গো
ভাইজান এই নাঙ্গারই হাতে গো।
শেনেন শোনেন মুমিন ভাইজান গো
ভাইজান যাবো ইস্কুলেতে গো।
মনে বড় আশা ছিল ভাইজান গো
ভাইজান যাবো ইস্কুলেতে গো।
একটা পয়সা কি দিবেন গো
ভাইজান এই নাঙ্গারই হাতে গো।'

এই গানের সুর ও কথা নসিমন পালা থেকে নেওয়া। আর এই গানের মধ্যে নাচতে নাচতে রতনের মামী হাসিয়া বেগম এবার ঘরের বারান্দায় বসা রতনের ফুপার কাছে ভিক্ষা চেয়ে বসে। একটি হাত কপালে তুলে, অন্য হাতটি পশ্চাতে দিয়ে নেচে সে ভিক্ষা চাইতে থাকে। তার পেছনে এ ভিক্ষার সময় অন্য তিনজন সঙও দাঁড়িয়ে যায়। অতএব, রতনের ফুপার ভিক্ষা না দিয়ে আর কী উপায়। বেচারা অনেক ভেবেচিন্তে পকেট থেকে কিছু টাকা বের করে দেয়। সে টাকায় সঙের নারীরা খুব একটা খুশি হতে পারে না। তাই আরো সময় পার করে তার সামনে নেচে নেচে। কিন্তু তাতেও কোনো ফল হয় না, ব্যর্থ মনোরথে তারা এবার ছেলের দাদার সামনে আবার ভেড়ে। কেননা, এর আগে তারা ছেলের দাদার পকেট খসাতে পারেনি। এবার তারা মরিয়া হয়, ছেলের দাদার পকেট খসাতেই হবে। রতনের দাদা-দাদীর সামনে গিয়ে ভাঙুড়ে সঙ পরম আকুতিতে এবার বলে–'মা সগোলরা, বাবা সগোলরা, এক বাড়ির কাম না। পাঁচ বাড়ির কাম। যা দেবেন, দিয়ে দেন।' তার আকুতির নেপথ্যে উঠানে রতনের মামী হাসিয়া বেগমকে তখন ভাবে পেয়ে গেছে, তার গান-নাচ তাই থামেনি। সে গাইছে–

'শিশুকালে কথা দিলাম তুমার কথা রাকবো
ছোটকালে বড়কালে তুমার ভালবাসবো।'

একদিকে ঘুঙুরের মৃদু নিক্বণে রতনের মামী হাসিয়া বেগম গুনগুনিয়ে গাইছে, অন্যদিকে ছানার মার একটাই আকুতি– ছেলের দাদা-দাদীর কাছে, সেই তার ছোট মেয়ের কাছে– 'এই দেখেন শোনেন, বাবা সগোল, মা সগোল, আপনার বাপের বিনা দোষ নেই...কিছু দিতি কন...।' সঙের মানুষের প্রাপ্য সম্মান মিলছে না দেখে নুলো সঙ রেহেনার মা পেছনে রতনের মামীর নাচ-

গানকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দেয়–'তুমি খালি ওই কুদাইকালে নছিমনেই থাকো! থামাও।' রতনের মামীর নাছিমনের নাচ-গান থেমে যায়। বাড়িতে এবার হৈচৈ পড়ে যায়। তার মধ্যে ভাঙুড়ে সঙের চিৎকার থামে না। সে বলতে থাকে–'এই থোনেন থোনেন, আপনেরা থবাই থোনেন, চুপচাপ থাকেন, আমার কুতি দেন...।'

: আচ্ছা কও...

: আপনার বাপের দোষ, কিছু দিলি সমাধা হোবি... আবার নাচ-গান হোবি

: হ'হ দিতি হোবি

সঙের নারীদের প্রতি বা বাবার পক্ষ নিয়ে ছোট মেয়ে রোকেয়া মুখ টিপে হেসে বলে–'বাপের তে বাদ দিতি হ'বি।'

: না না তা হবে না, মুরব্বি মানুষ কিছু দিতি হবি...

সঙের নারীদের অর্থ বসচাকে অন্যদিকে মোড় ঘুরিয়ে দিতে প্রতিবেশীদের একজন হঠাৎ আসরে পুরুষ সেজে আসা একমাত্র সঙ আলতাফের মাকে উদ্দেশ্য করে বলে–'আলম সাধু আজ পাল্লা দিতি পারতেছে না।'

: হ'হ' পাল্লা দিতি হোবি।

দর্শকদের মধ্যে হুল্লোড় পড়ে যায়। ছানার মা তখন আরো জোরে চিৎকার করে রোকেয়াকে বলে–'থোনেন থোনেন, আরে থোনেন, আপনার বাপ কি ক'রেচে তা জানেন– আতাগাছের পাতা, লম্বা গাছের ফল, নরমের বা হাত, দাঁত ভিখেরি সব এক করতেছে...।'

এবারে আলতাফের মা হায়াতুন নেছা বেশ সক্রিয়। বলে– 'করুক গো। এই যে শোনো ইট্টু গায়ে দিই।' বাক্যটি শেষ করে নেচে নেচে গাইতে থাকেন–

'যাবো লো সই তোদের বাড়ি পাখা বেচিতে॥

আমার পাখার এমনি গুণ হওয়ার চলে চতুকগুণ॥

যাবো লো সই তোদের বাড়ি পাখা বেচিতে॥'

শুধু পাখা বেচার গান নয়, হায়াতুন নেছা এবার ফিরে যান গাজীর গানের সব থেকে রসালো অংশের গীত-নৃত্য ও অভিনয়ে। প্রায় ৬০ বছরের হায়াতুন নেছার প্রাণবন্ত নাচ-গানে আমি হঠাৎ হা হয়ে যাই–

'শালি হি হি শালার পো হট্ট মারে দে
তার মাতায় বুজা তার পুঙার খুচা।
তার কোন বাবাজি? শালি হি হি...'

এ আসরে হায়াতুন নেছা একাই গাজীর গানে দুই চরিত্রের অভিনয়-গীতি করতে থাকে। কালুর ধাঁধা বয়ানে সে এবারে গাজীর উত্তরটাও গেয়ে দেয়–

'শোন কালাচান আমি বলি ইহার মানেও আমি জানি
ওরে রে এ এ এ।
তার মাতার বুজা তার পুঙার খুচা
তার চুলো বাবাজি। শালি হি হি...
শালি হি হি শালার পো হট্ট মারে দে
তোর চামড়া ভিতর চামড়া ঢুকায় তার

মুসলমানি অনুষ্ঠানের একটি অপরিহার্য আয়োজনে থাকে মেয়েদের সমবেত গীত গান

বাহারি সাজে সঙের নারীদের গানের সঙ্গে নাচের মুদ্রা

কোন বাবাজি।
শালি হি হি...
শোন কালাচান আমি বলি ইহার মানেও আমি জানি
ওরে রে এ এ এ।
চামড়ার ভিতর চামড়া ঢুকায় তার জুতো বাবাজি।
শালি হি হি...

গাজীকে ফকির হওয়ার আগে কালু এভাবেই বাজিয়ে নিয়েছিল। এই গীতিনৃত্য গাজীর গানের একটি হাস্যরসাত্মক অংশ, কিন্তু এই অংশটির পরপরই হায়াতুন নেছা গাজীর গানের করুণ রসাত্মক অংশের মায়ের ক্রন্দন-গীতি পরিবেশন করে– মায়ের কাছ থেকে গাজী যখন ফকির হওয়ার জন্য বিদায় চায়, তখন তাদের মা যেভাবে কেঁদেছিল, তা উঠে আসে হায়াতুন নেছার কণ্ঠে–

'আরে ও ফকির হয়ো না
সুনার গলেতে খিলকা থাকবো না।'

মায়ের ক্রন্দনে গাজীর ফকির হওয়ার সাধ কিছুক্ষণের জন্যে দ্বিধায় পড়ে যায়। তাই সে গায়–

'আরে তুমি ফকির হও কালাচান গো ওরে রে রে
আরে আমি হবো না।'
'ও ফকির হয়ো না... সুনার গলেতে খিলকা থাকবো না।'

গাজীর দ্বিধার ভেতর মা আরো তীব্রভাবে ক্রন্দনে গাইতে থাকে– 'ফকির হয়ো না।' কিন্তু মায়ের ক্রন্দনে গাজী-কালু শেষ পর্যন্ত থেমে থাকে না। তারা যথার্থই ফকির হয়ে যায়। তখন তাদের মা গায়–

'আরে একটা ভাই তার গোহুর বরণ গো
আরেক ভাই তার কালারে

সঙের মধ্যে টাকা আদায় করে সবার সামনে সে টাকা তুলে ধরে দাতার নামে নাচ গান চলছে

একি জ্বালা হয় রে!
ওরে কালা রূপ দেখলাম গো দুই নয়নে।
কি কবো আর ফকিরের কতা গো...
গোহুর কালা রূপ দেখলাম গো দুই নয়নে।
আরে কি বলিবো কুথায় যাবো রে...'

গাজী-কালুর মায়ের এই গীতি-নৃত্যে হায়াতুন নেছা যেন হাঁপিয়ে ওঠে। সে গানের মধ্যে তাই হঠাৎ করে বলে ওঠে– 'আর না, বই পাঠ আর না। ইবার অন্য গান।' 'হ হ গাও।' দর্শকরা গানের মজা পেয়ে গেছে, তারা আরো শুনতে চায়। কিন্তু হায়াতুন নেছা ক্লান্ত হয়ে আসর শেষ করতে তোলা তোলার গান গায়–

'একটি পয়সা দেবেন আব্বাজান গো।
বাজান এই কাঙ্গালের হাতে গো।
একটি পয়সা দেবেন আম্মাজান গো...
মনে বড় আশা ছিল গো আব্বা যাবো ইস্কুলেতে গো।
সেই তা আব্বা হয়নি আব্বাজান গো
আব্বাজান কপালের ওই দোষে গো।'

'একটি পয়সা' পাওয়া মানে তাদের

সঙের আয়োজনও শেষ। অনেক রাত হয়েছে। পয়সা তারা এবার যেন আমার কাছেই চেয়ে চেয়ে গান গায়। আমি তাদের মন-মতি বুঝে পকেট থেকে একশটা টাকা বের করে দিই। ও আল্লা, টাকা পেয়ে সঙগণ তা কপালে ছোঁয়ায়। দেখি, আমারই গেয়ো নামটি ধরে গান জুড়ে দিল। অবাক কাণ্ড তো! গানে শুধু আমার নাম নয়, আমার বংশ পরিচয়, গ্রামের নাম, পিতার নাম সবই তারা প্রকাশ করে দিল। তারা গাইল–

'বসন্তপুরির তুতা আলী মুল্লা গো
ওরে রে রে হে।
একশ টাকা করল দানও রে।
দয়াল আল্লারে।
দশে মানে দশে চেনে তাইরে গো। ওরে রে রে।
বসন্তপুরির শুকুর আলী মুল্লার ছেলে গো।
ওরে রে রে হে।
একশ টাকা করল দানও রে।
দয়াল আল্লারে।
দশে মানে দশে চেনে তাইরে গো
ওরে রে রে হে।
তাই আমরা মান্য করি রে। দয়াল আল্লারে।'

ভেবেছিলাম এই গানেই আসর শেষ হবে। কিন্তু তা হলো না। আসরে আলতাফের

পরদিন গোসলের পর রতনের মুখে ক্ষীর তুলে দেয় রতনের মা

মা হায়াতুন নেছা আবারও গান গেয়ে উঠল–

'আরে আড়ো কান্দির ফকির মিয়ে ভাই
সে দুই বউর জ্বালা পায়।
উঠতে গেলি মাতা ঘোরে জল পড়ে দুই চোখেতে।
দুই বউর জ্বালাতে।'

ব্যক্তিগত জীবনে আলতাফের মায়ের স্বামীর দুই বউ। আমাদের ভাঙুড়ে সঙ ছানার মার স্বামীরও দুই বউ। এবার তারা দুই বউয়ের স্বামী ও তাদের দুই বউ নিয়ে ছোট ছোট রঙ-তামাশা করতে লাগল। এ পর্যায়ে আমার বিস্ময় আরো এক ধাপ বেড়ে গেল– ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অভিনয় সঙের আসরে তারা বেশ মজা করে।

ব্যাপারটি বেশ উপভোগ্য। এবারে শার্ট-প্যান্ট পরা, মুখে পাটের দাড়িগোঁফ লাগানো, মাথায় গামছা বাঁধা, ছেঁড়া ছাতা বহনকারী হায়াতুন নেছার স্বামীর ভূমিকায় অভিনয়-চরিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রে দুই বধূর চরিত্রে অভিনয় করে ছানার মা অর্থাৎ ডালিম ও রতনের মামী বা হাসিয়া। হায়াতুন নেছা ও ডালিয়ার জীবনে আলাদা আলাদাভাবে দুই সতীনের অভিজ্ঞতা আছে। অন্যদিকে তারা তাদের নিজ নিজ স্বামীর দুই বধূ নিয়ে সমস্যাটাও প্রত্যক্ষ করেছে। আর এসব নিয়েই তারা গ্রামের মানুষের সামনে মুক্ত মনেই রসিকতা করার সাহস করেছে। যে সাহস অনেক ক্ষেত্রেই তথাকথিত নাগরিক ও শিক্ষিতজনদের নাকি নেই। অতএব, ধন্য হোক গ্রামীণ মানুষের সহজ-স্বাভাবিক জীবনাচার আর আনন্দানুষ্ঠান।